আল্লামা মুহাম্মদ আসাদের নাটকীয় জীবনের কিছু কথা

শাহেদ আলী

মুসলিম বিশ্বের আকাশ থেকে প্রজ্ঞা ও মনীষার উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটি খসে পড়ে ১৯৯৪ সনে। পশ্চিমা জগতের দৃষ্টিতে এই নক্ষত্রটির আলো ছিলো প্রখর, চোখ ধাঁধানো; তাই তারা প্রায় শতাব্দীকালে একে চোখের সামনে দেখেও না দেখার ভান করেছে। এই মনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন পশ্চিমে ইউরোপীয় পরিবেশে। অথচ তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন- এর বাহ্য জাঁকমকের অন্তরালে লুক্কায়িত অতল-গর্ভ শূন্যতাকে দুনিয়ার সামনে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিলেন। এ জন্য পাশ্চাত্য জগতে তাঁকে বরাবর বিরক্তির সাথে উপেক্ষা করার চেষ্টা করেছে। তাঁর ইন্তেকালের খবর কোন প্রচার পায়নি পশ্চিমী প্রচার মাধ্যমে।

আর রাতকানা মানুষ যেমন চাঁদ-নক্ষত্র কিছুই দেখে না, অন্ধ যেমন সূর্য দেখে না, তেমনি মুসলিম বিশ্বের দৃষ্টিতেও এই নক্ষত্রের কিরণের জ্যোতি কখনো পুরোপুরি প্রতিবিম্বিত হয়নি। তাই তার আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটি খসে পড়লেও তার কোন শূন্যতা মুসলিম বিশ্ব অনুভব করে নি- সূর্য বা নক্ষত্রের উদয়-অস্তে অন্ধের কিছুই আসে-যায় না। তাদের নিজস্ব কোন প্রচার মিডিয়াও নেই। তাছাড়া যা কিছু আছে তাতেও এই মৃত্যু তেমন কোন গুরুত্বই পায় নি। তাঁর না-কি অসিয়ত ছিলো- তাঁর কবর যেন হয় মক্কায়- যেখানে তিনি দীর্ঘদিন বসবাস করে ইসলামকে আবিষ্কার করেছিলেন, ইসলামের সেরা ব্যাখ্যাদাতা এবং প্রতিনিধি হয়ে উঠেছিলেন, ইসলাম কবুল করে সারা বিশ্বের মোকাবেলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরেছিলেন, লিখেছিলেন Road to Macca-র মত বিশ্বে আলোড়ন জাগানো বই। কিন্তু তাঁর সে সাধ পূরণ হয় নি। তিনি স্পেনে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

মুহাম্মদ আসাদ, ইসলাম কবুল করার আগে যার নাম ছিলো লিওপোল্ড লুইস, তাঁর স্ত্রী পোলা হামিদা আসাদকে নিয়ে প্রায় ২৬/২৭ বছর বাস করেছিলেন মরক্কোর তানজিয়ার্স শহরে।

> তিনি রাবেতা আলম ইসলামীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন কুরআনুল কারীমের একখানি সংক্ষিপ্ত তাফসীরসহ তরজমা করার জন্য। প্রথম দশ পারার তাফসীর প্রকাশিত হলে কোন কোন আলিম, তাঁর কোন কোন ব্যাখ্যা সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন। তখন আসাদ রাবেতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে মরক্কো চলে যান এবং আর্থিক অসুবিধা সত্ত্বেও, কেবল তাঁর স্ত্রী ও কতিপয় বন্ধু-বান্ধবের সহায়তায় তিনি একাই অনুবাদ ও তাফসীর সম্পূর্ণ করে তা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। সুদীর্ঘ ২০ বছরের সাধনার পর তাঁর তরজমা ও তাফসীর তিনি প্রকাশ করেন। আধুনিক বিশ্বে কোরআনুল কারীমের আধুনিকতম তরজমা ও তাফসীরকারকের দায়িত্ব পালন করেন।

লিওপোল্ড লুইসের জন্ম ১৯০০ সনে, বর্তমান পোলান্ডের লেমবার্গ শহরে এক ইহুদী পরিবারে। তাঁর পিতামহ ছিলেন কয়েক পুরুষ বিস্তৃত এক ইহুদী রাব্বী বা পুরোহিত পরিবারের শেষ রাব্বী হিসাবে। তাঁর পিতাকে ট্রেডিশনাল ইহুদী রাব্বী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা দেওয়া হলেও তিনি সে পারিবারিক ঐতিহ্য ত্যাগ করে ব্যারিস্টারী অধ্যয়ন করেন, নামকরা আইনজীবী হয়ে উঠেন এবং বিয়ে করেন এক ব্যাংকার পরিবারে। স্কুলের সাধারণ পড়াশোনার সঙ্গে লুইস লাভ করেন হিব্রু ধর্মগ্রন্থসমূহের সঙ্গে

গভীরভাবে পরিচয়। ১৩ বছর বয়সেই লুইস হিব্রু ভাষা অনর্গল বলতে ও পড়তে শিখেন এবং আর্মায়িক ভাষার সঙ্গেও সুপরিচিত হয়ে উঠেন। এই বয়সেই তিনি তালমুদের মূল পাঠ ও ভাষ্যের সঙ্গে সম্যক পরিচয় লাভ করেন। বহু বছর পর এ বিষয়ে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক আত্মচরিত Road to Macca-তে লিখেন আমার মনে হলো ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং তালমুদের আল্লাহ যেন তাঁর পূজারীরা কিভাবে তাঁর পূজা করবে তার অনুষ্ঠানগুলো নিয়েই ব্যস্ত। আমার আরো মনে হতো আল্লাহ যেন বিশেষ একটি জাতির ভাগ্য নিয়ে বিস্ময়কর রূপে ব্যস্ত রয়েছেন পূর্ব থেকেই। ইব্রাহীমের বংশধরগণের ইতিহাসরূপে ওল্ড টেস্টামেন্টের কাঠামোটিই এমন যে, মনে হয় আল্লাহ যেন গোটা মানবজাতির স্রষ্টা ও পালনকর্তা নন, বরং তিনি যেন এক উপজাতীয় দেবতা, যে দেবতা একটি মনোনীত জাতির প্রয়োজনের সঙ্গে গোটা সৃষ্টির সংগতি বিধান করে চলেছেন।

ইহুদী মতবাদ নিয়ে নিরাশ হলেও, লুইস কিন্তু অন্য কোন পন্থায় আধ্যাত্মিক সত্যানুসন্ধানে গেলেন না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং অনেকটা উন্নাসিকতার সঙ্গে শিল্প ও দর্শনের ইতিহাস অধ্যয়নে মনোযোগী হন। কিন্তু এই একাডেমিক জীবন তাঁর ধর্মীয় তাৎপর্য অনুসন্ধানের অন্তর্নিহিত তৃষ্ণা নিবারণে ব্যর্থ হলো। তাঁর এ্যাডভেঞ্চারের বাসনাও তাতে তৃপ্ত হলো না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভিয়েনা কিন্তু মরিয়া হয়ে নিয়োজিত ছিলো তার স্বকীয়তা ও আত্মপরিচয় লাভের প্রয়াসে। যুদ্ধ এবং ৬০০ বছরের পুরনো হ্যারসবুর্গ রাজতন্ত্রের পতন পুরনো মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যগুলোর ভিত্তি ধসিয়ে দেয়। অবশ্য এর পূর্বে এগুলো শিল্পবোদ্ধা ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর আক্রমণের বিষয় হয়ে উঠেছিল। এক সংশয়বাদী পরিবারের প্রভাবে লুইস তাঁর তরুণ বয়সের অন্য বহু বালকের মতোই সকল আনুষ্ঠানিক ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে বসেন। তাঁর তখন লক্ষ্য ছিলো র্কম, দুঃসাহসিক অভিযান এবং উত্তেজনা। এই তাড়নাবশে তিনি অস্ট্রিয় সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে চেয়েছিলেন এক ছদ্মনামে, কারণ তখন তাঁর বয়স আঠারো বছর হয় নি। ফলে তাঁর স্বপ্ন ব্যর্থ হলো। চার বছর পর যখন তিনি আইনত ভর্তি হলেন সামরিক বাহিনীতে তার আগেই তাঁর সামরিক গৌরবের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। কারণ কয়েক সপ্তাহ পরেই ঘটলো বিপ্লব, অস্ট্রিয় সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ল এবং যুদ্ধও শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু আন্ত-একাডেমিক জীবনের কোন আকর্ষণই লুইসের ছিলো না। তিনি অনুভব করেছিলেন, জীবনের সাথে গভীরভাবে মোকাবেলা করার আকাঙ্ক্ষা-জীবনে প্রবেশ করার বাসনা। নিরাপত্তা-প্রিয় মানুষ নিজের চারপাশে যে-সব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে লুইস সেগুলোর আশ্রয় না নিয়ে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন জীবনে- চেয়েছিলেন সবকিছুর পেছনে যে আধ্যাত্মিক নিয়ম-শৃঙ্খলা রয়েছে তা উপলব্ধির পথ নিজেই খুঁজে বের করতে। বিশ শতকের গোড়ার দিকের দশকগুলোর একটি বিশেষ লক্ষণ ছিলো আধ্যাত্মিক শূন্যতা। বহুশত বছর ধরে ইউরোপ যে-সব মূল্যবোধে অভ্যস্ত ছিলো, সে সমুদয়ই, ১৯১৪-১৯১৮-এর মধ্যে যা ঘটলো তাতে নিজস্ব রূপরেখা হারিয়ে নিরাকার, নিরবয়ব হয়ে পড়লো। সে শূন্যতা পূরণ করতে পারে এমন নতুন কোন মূল্যবোধ কোথাও দেখা যাচ্ছিলো না। ক্ষণভঙ্গুরতা ও অনিশ্চয়তার ভাব, সামাজিক, মানসিক ওলটপালটের পূর্বাভাস মানুষের চিন্তা ও প্রয়াসে স্থায়ী বলে কিছুই নেই এমন একটা সন্দেহের জন্ম দেয় তরুণ মনে। তরুণের আত্মিক চাঞ্চল্য কোথাও কোন নির্ভর খুঁজে পাচ্ছিলো না। লুইস এবং তার মত নবীনেরা যে-সব প্রশ্নে হতবুদ্ধ হয়ে পড়েছিল নৈতিকতায় নির্ভরযোগ্য মানের অভাবে কেউ তাদের সে সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারছিলেন না।

লুইস দেখতে পেলেন, বিজ্ঞান বলে জ্ঞানই সব অথচ একটা নৈতিক লক্ষ্য ছাড়া জ্ঞান কেবল বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করতে পারে। এতে সন্দেহ নেই যে, সে সময়কার সমাজ সংস্কারক, বিপ্লবী এবং কমিউনিস্টরা একটা মহত্তর এবং অধিকতর সুখী দুনিয়া নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লুইসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়লো এরা সকলেই চিন্তা করছে, কেবল বাহ্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার আলোক এবং এসব ক্ষেত্রে এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য ওরা জিয়নবাদী ধারণাকে এক নতুন অধিবিদ্যা বিরোধী অধিবিদ্যায় উন্নীত করেছে। তারা দেখতে পেল, তাদের চারপাশের পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে অনেক সময় কল্পিত ঐশী গুণাবলীর সঙ্গে তার অসঙ্গতি প্রচণ্ড। আল্লাহর প্রতি যে-সব গুণ আরোপ করা হয়, মানব ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক শক্তিগুলো যেন সেগুলো থেকে স্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র ও আলাদা। এ থেকে তারা সিদ্ধান্তে এলো আল্লাহ বলে কিছুই নেই। ধর্মের আত্মাভিমানী অভিভাবকেরা আল্লাহকে তাদের নিজেদের পোশাক পরিয়ে মানুষের ভাগ্য থেকে আল্লাহকে বিচ্ছিন্ন, সম্পর্কহীন করে ফেলেছিলো। কিন্তু এতে তো সমস্যার সমাধান হলো না, ব্যক্তি-জীবনে কিংকর্তব্য সম্বন্ধে এই অনিশ্চয়তা ও পরিবর্তনশীলতা ঘোর বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে উঠতে পারে, সৃষ্টি করতে পারে মানুষের প্রতি মানুষের, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যবোধের প্রতি অশ্রদ্ধা। এই সহজাত উপলব্ধির কারণে লুইস এখানেই থামলেন না। তাঁর জন্য মহৎ জীবনকে গড়ে তোলা তাঁর দিকে আশার একটা সৃজনধর্মী পথ অনুসন্ধানের জন্য সহায়ক হয়ে উঠলো। এই তাগিদে তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তার মূল পাঠ্য-বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন শিল্পকলার ইতিহাস। কিন্তু পাঠ্য বিষয় লুইসকে তৃপ্ত করতে পারলো না। তিনি দেখতে পেলেন তাঁর শিক্ষকেরা- যাদের মধ্যে স্ট্রজিগোভস্কি এবং দভোরাক ছিলেন বিখ্যাত এবং বিশিষ্ট সৌন্দর্যতত্ত্বের যে-সব নিয়ম-কানুন দ্বারা শিল্প সৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত হয়, সেগুলো আবিষ্কার করতেই ছিলেন অতিমাত্রায় ব্যস্ত; এর মর্মমূলে যে আধ্যাত্মিক তরঙ্গাভিঘাত রয়েছে তা উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা খুব সামান্যই করেছেন, অর্থাৎ লুইসের মতে, শিল্পকলার প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সেইসব রূপ ও আঙ্গিকের মধ্যে ছিলো সংকীর্ণভাবে সীমাবদ্ধ, যেগুলোর মাধ্যমে আর্ট লাভ

করা অভিব্যক্তি।

লুইস তাঁর যৌবনোচ্ছল বিভ্রান্তির দিনগুলোতে ইউরোপ নবীন মনোবিকোলন শাস্ত্রের যে-সব সিদ্ধান্ত নিয়ে মেতে উঠেছিলেন তার সঙ্গে পরিচিত হয়েও তিনি তাতে তৃপ্তি পেলেন না - পেলেন না তাঁর জিজ্ঞাসার জবাব, যদিও তখন মনোবিকোলন তত্ত্ব দেখা দিয়েছিল একটা প্রথমশ্রেণীর বিপ্লবরূপে। মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে নির্জ্ঞান মনের কামনা-বাসনার যে ভূমিকা রয়েছে তার আবিষ্কার গভীরতর আত্মোপলব্ধির পথ সন্দেহাতীতভাবে মুক্ত করে দিয়েছে- তরুণ লিওপোল্ড লুইসের এই বিশ্বাস বেশিদিন স্থায়ী হলো না। তাঁর কাছে ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারার উদ্দীপনা ছিল মদের মাদকতার মতোই তীব্র। ভিয়েনার ক্যাফেগুলোতে তিনি তন্ময় হয়ে শুনেছেন মনোবিকোলন তত্ত্বের শুরুর দিকের কয়েকজন পথিকৃত- আলফ্রেড এডলার, হার্মান স্টিকেল এবং অটোগ্রাস প্রমুখ পণ্ডিতের নিজেদের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ তর্ক-বিতর্ক, কিন্তু লুইস এই নতুন বিজ্ঞানের বুদ্ধিগত ঔদ্ধত্যে বিচলিত হয়েছেন। কারণ তাঁর মতে, এ বিজ্ঞান মানুষের আত্মার সকল রহস্যকে কতগুলো স্নায়বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় পর্যবসিত করতে চায়। তিনি উপলব্ধি করলেন পরম সত্যগুলোর কাছাকাছি পৌঁছানোর ক্ষমতাও এই নতুন শাস্ত্রগুলোতে নেই। তাছাড়া, মহৎ ও উন্নত জীবনের দিকে কোন নতুন পথের নির্দেশও তিনি এতে পেলেন না।

মহাযুদ্ধের পরপর সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত মূল্যগুলোর ব্যাপক ভাঙ্গন শুরু হলো, সেই ভাঙ্গনের ধারায় নারীর-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে বিদ্যমান অনেক বাধা-নিষেধও শিথিল হয়ে পড়লো। এ ছিল একটি অবস্থা থেকে তার সম্পূর্ণ বিপরীত আর একটি অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হওয়া, যেখানে সবকিছু হয়ে পড়েছিলো বিতর্কের বিষয়, অর্থাৎ অবস্থাটা এই দাঁড়ালো : কান পর্যন্ত মানুষের নিরবিচ্ছিন্ন ঊর্ধ্বাভিসারী অগ্রগতিতে মানুষের যে বিশ্বাস ও আস্থা ছিল তা থেকে মানুষ নিক্ষিপ্ত হলো স্পেশলারের তিক্ত নৈরাশ্যের দিকে, নীটশের নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ ও মনোবিকলন সৃষ্ট আধ্যাত্মিক শূন্যতার মধ্যে। শরীরের যুক্তি অভিলাষী তরুণ-তরুণীদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক হলো নির্বিচার আপতিক, অবাধ। লিওপোল্ড লুইসের মনে হতো এ আর কিছুই নয়, ফাঁকা প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তাঁর মনে হলো একজন পুরুষ থেকে আরেকজন পুরুষকে যে ভয়ংকর নিঃসঙ্গতা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে হয় তো তা দূর হতে পারে একটি নারী ও পুরুষের মিলনে। এই মানসিক চাঞ্চল্য ও অস্থিরতার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব হলো না। তাঁর আব্বা তাঁকে পণ্ডিত পি.এইচ.ডি বানাতে চেয়েছিলনে। কিন্তু তা ছেড়ে দিয়ে তিনি তাঁর পিতার অমতে বেছে নিলেন সাংবাদিক জীবন- তিনি লেখক হবেন এবং লেখাই হবে তাঁর পেশা।

ভিয়েনা থেকে তিনি পৌঁছুলেন প্রাগে- যেখানে একটি পুরনো ক্যাফে, দ্য ওয়েস্টেনসে শিল্পী-সাহিত্যিকদের এক ঐন্দ্রজালিক চক্রের সঙ্গে পরিচিত হলেন। কিছুদিন পর তাঁর পিতা খবর পেয়ে চিঠি লিখলেন, আমি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমি এক ভবঘুরে বাউণ্ডুলে হিসেবে মরে পড়ে রয়েছ রাস্তার নর্দমায়। প্রবল আত্মবিশ্বাসী জেদী তরুণ লুইস জবাব দিলেন- না। আমার জন্যে রাস্তার পাশে নর্দমা নেই, দেখবেন আমি উঠবো একেবারে শীর্ষচূড়ায়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি লেখক হতে চান; তাঁর এই বিশ্বাস জন্মেছিল-তাঁর জন্য সাহিত্যিকদের জগৎ অপেক্ষা করছে সাগ্রহে, দরাজ দু'হাত বাড়িয়ে। কিন্তু সেদিনে মশহুর কোন সংবাদপত্রে প্রবেশাধিকার ছিল কঠিন ব্যাপার। বার্লিনের রাস্তায় রাস্তায় দিনের পর দিন তিনি পায়চারী করেছেন, সাবওয়ে বা ট্যাক্সির ভাড়া নেই। বহু সপ্তাহ তিনি কাটালেন, কেবল চা এবং বাড়ীওয়ালি সকালে যে দু'টি পাউরুটির টুকরা দিতেন তা খেয়ে। তাঁর তখনকার এই দিনগুলোর নিয়তি ছিল নির্জলা উপবাস। আর তার রাতের স্বপ্ন ঠাসা থাকতো সসেজ আর মাখন মাখানো পুরু রুটির টুকরায়।

এই চরম আর্থিক দৈন্যের মধ্যে এক চলচ্চিত্র প্রযোজকের সহকারী হিসাবে কাজ করে এবং পরে তাঁর ভিয়েনিজ বন্ধু এন্তোন কুহের জন্য ফিল্মের সিনারি লিখে দিয়ে এবং পরে আরো একটি সিনারি লিখে কিছু অর্থ উপার্জন করে কিছুদিন কাটালেন। এরপর আরো একটি বছর মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন শহরে নানারকম অস্থায়ী কাজ করে শেষ পর্যন্ত তিনি প্রবেশ করলেন খবরের কাগজের জগতে ১৯২১ সনে। জার্মান ক্যাথোলিক সেন্টার পার্টির বিত্তশালী সদস্য ডর ডেমার্ট, জার্মান রাজনৈতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যিনি ইউনাইটেড প্রেস অব আমেরিকার সহযোগিতায় ইউনাইটেড টেলিগ্রাফ নামে একটি বার্তা সংস্থা শুরু করতে যাচ্ছিলেন। তাঁরই প্রতিষ্ঠানে সহকারী হিসেবে কাজ করার আবেদন জানিয়ে পেলেন টেলিফোনিস্টের কাজ। তাঁর উচ্চাকাংখার জন্য এ ছিল একটি অতি অপমানজনক কাজ। কিন্তু কাজটি গ্রহণ না করে লুইসের উপায় ছিল না। এভাবে একমাস কাজ করার পর তিনি, গোপনে বার্লিনে আগত মাদাম ম্যাক্সি গোর্কী, যিনি ১৯২১-এর রাশিয়ার চরম দুর্ভিক্ষের সময় এখানে এসেছিলেন মধ্য ইউরোপীয় রাজধানীগুলোতে কার্যকরী ত্রাণ সাহায্যের জন্য জনমত গঠন করতে। তাঁরই সঙ্গে এক সাক্ষাতকার ঘটিয়ে টেলিফোনিস্ট লিওপোল্ড লুইস হয়ে পড়লেন এক রিপোর্টার। তিনি হলেন এক সাংবাদিক।

লিওপোল্ড লুইস তখন ২২ বছরের উত্তাল তরুণ। সমাজ বদলে দেবার, সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলার বাসনায় লুইস এবং তাঁর বয়সী তরুণেরা তখন অস্থির। সমাজকে কিভাবে গঠন করা উচিত যাতে করে মানুষ যথার্থ এবং পরিপূর্ণ জীবন-যাপন করতে পারে। কিভাবে বিন্যস্ত হওয়া উচিত তাদের সম্পর্ক যাতে করে একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা প্রত্যেকটি মানুষকে ঘিরে রেখেছে তা ভেঙ্গে-

চুরে সকলে বেরিয়ে আসতে পারে এবং সত্যিকার পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার মধ্যে কাটাতে পারে জীবন? ভাল কি, মন্দ কী, ভাগ্য কী, কিংবা ভিন্নভাবে বলতে গেলে মানুষের কী করা উচিত যাতে করে সে যথার্থ অর্থে কেবল মুখে নয় তার জীবনের সাথে এক ও অভিন্ন হতে পারে এবং বলতে পারে আমি এবং আমার অদৃষ্ট আলাদা নয়- একই?

সর্বত্র যখন নৈতিক ও সামাজিক অনিশ্চয়তার আবহাওয়া প্রবল তাই জন্ম দিয়েছিলো বেপরোয়া আশাবাদের। আর তার প্রকাশ ঘটেছিল একদিকে, -তাঁর সে সময়কার সঙ্গীতে, চিত্রকলা ও নাটকে। দুঃসাহসিক পরীক্ষণ-নিরীক্ষণে, অন্যদিকে সংস্কৃতির কাঠামো ও রূপরেখা সম্পর্কে অন্ধভাবে হাতড়ানাতে প্রায়াশ বৈপ্লবিক অনুসন্ধানে রত ছিল। কিন্তু এই জোর করে বাঁচিয়ে রাখা আশাবাদের পাশাপাশিই তখন চলছে একটি আধ্যাত্মিক শূন্যতা। একটা অস্পষ্ট উন্নাসিক আপেক্ষিকতাবাদ ক্রমবর্ধমান এক নৈরাশ্যবাদের মধ্যে যার জন্ম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর উচ্চগ্রামে বাঁধা ভাবাবেগ পীড়িত অসন্তুষ্ট উত্তেজিত ইউরোপীয় জগতে কিছুই আর চলছিল না আগের মতো স্বাভাবিক ও সুশৃংখলভাবে।

লুইসের চোখে ধরা পড়লো পশ্চিমা জগতের আসল মাবুদ আর আধ্যাত্মিক কিছু নয়। এর একমাত্র উপাস্য হচ্ছে কমফোর্ট, আরাম-আয়েশ-গড়পড়তায় একজন ইউরোপীয়, সে গণতন্ত্রী কমিউনিস্ট, মজদুর বুদ্ধিজীবী যে-ই হউক তার কাছে অর্থপূর্ণ বিশ্বাস ছিল একটি বৈষয়িক উন্নতির পূজা, কারণ জীবনকে ক্রমাগত সহজতর করে তোলা ছাড়া জীবনের আর কোন লক্ষ্য থাকতে পারে না। সাম্প্রতিক ভাষায় প্রকৃতির কবল থেকে মানুষকে আজাদ করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই নতুন ধর্মের মন্দির হচ্ছে বিশাল কল-কারখানা, সিনেমা, রাসায়নিক গবেষণাগার, নৃত্যশালা, প্রাণিবিদ্যা সংস্থাসমূহ। আর এ ধরনের মন্দিরের পুরোহিত ঠাকুর হচ্ছে ব্যাংকার, ইঞ্জিনিয়ার, রাজনীতিবিদ, চিত্রতারকা, পরিসংখ্যানবিদ, শিক্ষা পরিচালক, রেকর্ড স্রষ্টা, বৈমানিক এবং কমিশনারেরা। ভালো এবং মন্দের ধারণার ক্ষেত্রে সার্বিক মতানৈক্য এবং সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের সুবিধাবাদের আশ্রয় গ্রহণ-এর মধ্যে ঘটলো নৈতিক ব্যর্থতার প্রকাশ- সেই সুবিধাবাদিতার যা রাস্তার বারঙ্গনাদের সাথে তুলনীয়, যে বারঙ্গনা যখনই এবং যারই বাঞ্ছিতা হয় তখনই তার কাছে দেহ দান করে। সেই বয়সেই লুইস দেখতে পেলেন ক্ষমতা এবং সুখের অতৃপ্ত লালসাই পাশ্চাত্য জগতকে অনিবার্যভাবেই পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে রেখেছে। যে দলগুলোর প্রত্যেকেই মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এবং যখনই সেখানে তাদের পারস্পরিক স্বার্থে আঘাত লাগছে, তারা একে-অপরকে ধ্বংস করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠছ। তখন ন্যায়-অন্যায়ের সর্বোচ্চ মাপকাঠিই ছিল বাস্তব উপযোগিতা, জাগতিক সাফল্য।

লুইসের সেই সময়কার অবস্থা, লুইসের ভাষায় আমি দেখতে পেলাম জীবন কতো অসুখী এবং বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ কতো সামান্য। যদিও সমাজ ও জাতির উপর জোর দেয়া হচ্ছে কান ফাটানো উম্মত্ত চিৎকারের সঙ্গে। আমরা আমাদের সহজাত অনুভূতির দুনিয়া থেকে কতো দূরে সরে এসেছি। আর আমাদের আত্মা কতো সংকীর্ণ এবং দীপ্ত হয়ে উঠেছে। তখন আমাদের সকল চিন্তার আদি এবং অন্য ছিল ইউরোপ। এসব বিভ্রান্তি ও জটিলতার একটি সমাধান অন্তত আংশিক সমাধান হয় তো ইউরোপের নিজের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার বাইরে আর কোথাও থাকতে পারে। এ চিন্তা তখন লিওপোল্ড এবং তাঁর চারপাশের আর কারো মনে কখনো জাগেনি। এ সময় চৈনিক দার্শনিক লাওসের দর্শন তাঁকে কিছুকাল মোহাচ্ছন্ন রাখে। কিন্তু কালে তা তাঁর কাছে হয়ে উঠলো সুন্দর কবিতার বাহন- আর কিছু নয়। লাওসের পুস্তকটি তিনি রেখে দিলেন এই মনে করে যে, এ কোন হাতির দাঁতের তৈরী মিনারের দিকে স্বপ্নে ডাকছাড়া আর কিছু নয়। তিনি যে জগতের অংশ সেই বেশুরো তিক্ত ঘৃণ্য জগতের সাথে লুইস তাল মিলিয়ে চলতে পারছিলেন না।

লুইস বলেন, কিন্তু আমার চারপাশে যারা রয়েছে তাদের কিংবা তাদের মধ্যকার কোন দলের বিভিন্নমুখী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষায় শরিক হতে আমার অক্ষমতা কালক্রমে আমার মধ্যে এই অস্পষ্ট ধারণার রূপ নেয় যে, আমি ঠিক ওদের কেউ নই, ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই এবং তারই সঙ্গে আমার এ ধারণা জন্মাল যে, আমাকে কারো অঙ্গীভূত হতেই হবে- তবে কার? কোন কিছুর অংশ হতে হবেই- তবে কিসের? বুকভরা এই আকুতি ও অস্থিরতা নিয়েই তিনি ১৯২২ সনে তাঁর মাতা কোরআনের আহ্বানে ২২ বছর বয়সে পাড়ি দিলেন আরব মূলুক জেরুযালেমে। দীর্ঘদিন আরবদের সঙ্গে মেলামেশা করে তিনি পেলেন সেই জবাব। -তিনি কার অঙ্গীভূত হবেন, কিসের অংশ হবেন।

> ফ্রাংকফুর্টার শাইটুম নামক এক জগতবিখ্যাত কাগজের সংবাদদাতা হয়ে তিনি আসেন জেরুযালেম এবং কয়েক বছর সফর করেন মিশরে, ফিলিস্তিন, ট্রান্সজর্ডান, ইরাক, পারস্য ও আফগানিস্তান। জেরুযালেমে অবস্থানকালে, তিনি প্রথম ইসলামের সংস্পর্শে আসেন এবং আরবদের জীবন পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। আরবদের অন্তরঙ্গ মেলামেশার পর তিনি আবিষ্কার করলেন, ট্রাডিশনাল মুসলিম সমাজের মধ্যে রয়েছে মন ও ইন্দ্রিয়ের এক সহজাত সঙ্গতি, যা ইউরোপ হারিয়ে বসেছে। তিনি তাদের মধ্যে আবিষ্কার করলেন হৃদয়ের নিশ্চয়তা এবং আত্ম-অবিশ্বাস

থেকে মুক্তি, যে মুক্তি ইউরোপীয়দের স্বপ্নেরও অগোচর। তিনি কিসের অংশ হবেন, অবশেষে সেই জিজ্ঞাসার জবাব পেলেন লিওপোল্ড লুইস এবং ১৯২৬ সনে ইউরোপ ফিরে তিনি সস্ত্রীক কবুল করলেন ইসলাম। তাঁর মুসলিম নাম হলো মুহাম্মদ আসাদ। আসাদের আত্মকথা মক্কার পথ গ্রন্থ তাঁর এই ইসলাম কবুলকে বলা হয়েছে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন।

ইসলামে দীক্ষিত হবার পর আসাদ প্রায় ৬ বছর আরব দেশে বাস করেন, আরব জীবন ও ভাষার সঙ্গে তাঁর হয় গভীর পরিচয়। তিনি বাদশা ইবনে সউদের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেন। এরপর তিনি ভারতে যান এবং মহান মুসলিম কবি ও দার্শনিক আল্লামা ইকবালের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁরই পরামর্শে আসাদ তাঁর পূর্ব তুর্কিস্তান, চীন এবং ইন্দোনেশিয়া সফরের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন, ইসলামী রাষ্ট্রের বুদ্ধিবৃত্তিক সূত্রগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য তিনি ভারতে থেকে যান। ইসলামী রাষ্ট্র তখন এক স্বাপ্নিক কবির স্বপ্ন-বিহবল মনের স্বপ্ন-মাত্র ছিল। মুহাম্মদ আসাদের ভাষায় : আমার কাছে ইকবালের মতই স্বপ্ন ছিল- ইসলামের সমস্ত ঘুমন্ত আত্মাকে পুনর্জীবিত করে তোলার একটি পথের- বস্তুত একমাত্র পথের পথিক : একটি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সত্তা সৃষ্টি, যার সংহতির ভিত্তি একই রক্ত-মাংস নয়, বরং এটি আদর্শের প্রতি সাধারণ আনুগত্য। 'বহু বছর আমি নিজেকে নিয়োজিত রাখি এই লক্ষ্যে অধ্যয়ন, রচনা ও বক্তৃতায় এবং কালে ইসলামী আইনের ব্যাখ্যাদাতা হিসাবে কিছুটা খ্যাতি অর্জন করি।' কিন্তু এই অর্জনটা কিছু নয়, আসলে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে এই রাষ্ট্রের সরকার ইসলামী পুনর্গঠন বিভাগ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার এবং পরিচালনার জন্যে মুহাম্মদ আসাদকে আহ্বান করে, -এর লক্ষ্য রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে আদর্শগত ইসলামী ধ্যান-ধারণাগুলোকে বিশদভাবে তুলে ধরা, যার উপর নবজাত রাজনৈতিক সংগঠনটি তার আদর্শিক দিক-নির্দেশনার জন্য নির্ভর করতে পারে। মুহাম্মদ আসাদ দু'বছর এই অতিশয় উদ্দীপনাপূর্ণ কাজটি চালিয়ে যাবার পর পাকিস্তানের ফরেন সার্ভিসে যোগদান করেন। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তরে তিনি হন মধ্যপ্রাচ্য ডিভিশনের প্রধান। ইহুদীবাদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনীদের পক্ষে পাকিস্তান জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে যে যুক্তি ও তথ্যের লড়াই সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করে তার সমর্থনে সকল ঐতিহাসিক তথ্য ও দলিল-প্রমাণাদি সরবরাহ করেন মুহাম্মদ আসাদ। পররাষ্ট্র দপ্তরে তিনি আত্মনিয়োগ করেন, পাকিস্তান ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত করে তোলার জন্য। এই সময় মুহাম্মদ আসাদ নিযুক্ত হলেন জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে পাকিস্তানী মিশনে মিনিস্টার প্লেনিপোটেনশিয়ারী হিসেবে। পরে ১৯৫২ সালের শেষের দিকে তিনি এই পদে ইস্তফা দিয়ে তাঁর অমর গ্রন্থ The Road to Macca রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

সূত্রঃ আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা, এপ্রিল-জুন ২০০২ (অধ্যাপক শাহেদ আলী সংখ্যা)

শাহেদ আলী